উপসংহার

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লী স্থানান্তরের কারণে ব্যাপক প্রভাব পড়ে বাংলার অর্থনীতিতে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাব ভারতবর্ষে সেভাবে না পড়লেও ভারতবাসী ক্রমশ পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তি পেতে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করে। সামাজিক প্রেক্ষাপট বদলে যায় সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। ব্যতিক্রম ঘটেনি শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ১৯৩২-১৯৩৪ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন সংগঠিত হয়। ১৯৩৪ সালে এদেশে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল শাখারূপে স্বীকৃতি পায়। আবার ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বরে ব্রিটিশ সরকার এদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও ওয়ার্কর্স লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এই সময়কাল বাংলা সাহিত্যের প্রাণ পুরুষ রবীন্দ্রনাথ তখন নাটক উপন্যাসের জগৎ ছেড়ে কাব্য-কবিতা, সংগীত, প্রবন্ধ ও ছোটগল্পের সাধনায় ব্যাপৃত। বাংলা নাটকে মন্মথ রায়ের হাত ধরেই একাঙ্ক নাট্যরীতির যথার্থ প্রয়োগ ঘটে। এরকমই এক ক্রান্তিকালে ১৯৩৪ সালের ১ জুন বাংলাদেশের বরিশালে জন্ম গ্রহণ করেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই তিনি প্রত্যক্ষ করেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা। ১৯৪২ সালে অসহযোগ ও ভারত ছাড়ো আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। ১৩৫০ বঙ্গাব্দে মন্বন্তরের কারণে হাজার হাজার নরনারী একমুঠো খাবারের জন্য শহরের রাস্তায় ভীড় করে। ১৯৪৩ সালে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৪৪ গণনাট্যের সফল পথ চলা শুরু হয় বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের প্রযোজনার মধ্য দিয়ে। ১৯৪৫ সালে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি। ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মারাত্মক প্রভাব পড়ে ভারতবর্ষে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে। ১৯৪৭ সালের ১৫

আগস্ট কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভ হয় ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করে। মাত্র ১৩ বছর বয়সে বালক মোহিত চট্টোপাধ্যায় পরিবারের সঙ্গে জন্মভূমি ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন পাকাপাকি ভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ক্ষত নিয়ে। কলকাতা বসবাসকালে অপরিচিত মোহিত প্রথমেই বই এবং বসাক স্ট্রীটের লাইব্রেরীকে তাঁর সঙ্গী করে নিয়েছিলেন। এই নিঃঙ্গতা, একাকীত্ব, দেশভাগের যন্ত্রণা, তাঁকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। মায়ের সহজ-সরল স্বভাব কবিত্ব মোহিত চট্টোপাধায়কে কল্পনাপ্রবণ করে তোলে। কলেজের পাঠকালে বেশ কয়েকজন তরুণ প্রতিভাবান কবি সাহিত্যিকের সান্নিধ্য লাভ করেন তিনি। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই তাঁর কবি প্রতিভার বিকাশ। তাঁর কবি প্রতিভায় স্বাভাবিকভাবে প্রতিফলিত হয় ব্যক্তি জীবনে উপলব্ধ নিঃসঙ্গতা, একাকীত্ব, যন্ত্রণা। নিজের অস্তিত্বের সন্ধানে কবিতার জগত ছেড়ে নাটকের সাধনায় মগ্ন হন তিনি। তাঁর নাটকের পথ চলা অন্তর্জগৎ দিয়েই শুরু হয়। প্রথম নাটক 'কণ্ঠনালীতে সূর্য' থেকে শেষ নাটক 'তথাগত' পর্যন্ত নাট্য পরিক্রমায় তিনি প্রায় শতাধিক নাটকের বিষয়বস্তু চরিত্র-চিত্রণের মধ্য দিয়ে সমকালীন আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট, ব্যক্তির অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই, মানবিক সম্পর্কের টানাপোড়েন রূপায়িত করেছেন। তাঁর নাটক বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণে গড়ে উঠেছে। এই আলোচনায় ব্যক্তি জীবন, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে লেখা শিল্প সৃষ্টির পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে।

সূচনা লগ্ন থেকে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের তিরোধান কাল পর্যন্ত বাংলা নাটকের পর্যালোচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে নাটকের পর্বান্তরের ইতিহাস। এই পর্বের বিভাজনে সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ভাবনা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। সময়ের সঙ্গে সমাজ পরিবর্তিত হয়। পরিবর্তিত সমাজের প্রভাব শিল্প-সাহিত্যের প্রকরণগত ভিন্নতায় ধরা পড়েছে। উৎস সূত্রে বিনোদনমূলক শিল্প মাধ্যম থেকে নাটক হয়ে ওঠে মানব কল্যাণ- সমাজ কল্যাণের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। কালক্রমে নাটকের পরিধি বিস্তৃতি লাভ করে। নাট্য লক্ষণাত্মক উক্তি প্রত্যুক্তি মূলক সংঘাতপূর্ণ সাহিত্যিক উপাদান

নাট্যগুণান্বিত আঙ্গিকের রূপলাভ করে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নাটকের অনুবাদ কর্মের মধ্য দিয়ে নাট্যস্পৃহা চরিতার্থ হয় একসময়। পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য অনুকরণ পরিহার করার প্রয়াস এবং মৌলিক রচনা সংকল্প দেখা দেয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা নাটকে মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের পাশাপাশি সার্থক বিয়োগান্ত পরিণতি প্রয়োগ ঘটান। দীনবন্ধু মিত্র সমাজ জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরিখে নীলদর্পণ নাটক রচনা করেন। রাজনৈতিক মাত্রাও তাঁরই হাত ধরে নাটকে প্রাধান্য পায়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় পাশ্চাত্যের নাট্যরীতিকে তাঁর নাটকে তুলে ধরেন সার্থক ভাবে। একই সঙ্গে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাকেও তিনি সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন। গিরিশচন্দ্র বাঙালি হিন্দুর আবেগের বিষয় ভক্তিবিহ্বলতাকে গুরুত্ব দিলেন তাঁর নাটকে। তাঁর অবদানের জন্য বাংলা নাটক স্বর্ণযুগের স্তরে পৌঁছায়। এই সময়ের নাটকে শোনা গেল দেশাত্মবোধের জয়গান। পরবর্তীকালে বাংলা নাটক রবীন্দ্রনাথে হাতে ভিন্ন মাত্রা পায়। তিনি বাংলা নাটক জাঁকজমক পূর্ণ আড়ম্বরের ঘেরাটোপ থেকে মুক্তি দিতে চাইলেন। তাঁর হাতে বাংলা নাটক রূপক-সাংকেতিকতার দৃষ্টিদভঙ্গিতে প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি প্রথাগত ধারা থেকে বেরিয়ে নাটকের চরিত্রগুলিকে সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করলেন। বক্তব্য বিষয়কে সরাসরি পরিবেশন না করে ছদ্মবেশের আড়ালে ঢাকলেন। ভাবের পরিবর্তে বোধের আশ্রয়ে গড়ে তুললেন তাঁর নাট্য কাহিনিকে। বাংলা নাটকের ধারায় তিনি পূর্বাপরহীন একক ও অনন্য।

স্বাধীনতা পরবর্তী কালে বাংলা নাটকে হয়ে হয়ে ওঠে জনগণের নাটক। মার্কসীয় দর্শন তাতে প্রাধান্য লাভ করে। সাম্যবাদে বিশ্বাসী অধিকাংশ নাট্যকার সমবেত চরিত্রের দ্বারা প্রতিরোধ গড়ে তোলার চিত্র অঙ্কন করলেন। তাঁদের নাটকে একনায়কের পরিবর্তে গণ চরিত্র প্রাধান্য পায়। প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে যে নাটক ছিল অভিজাত বাবু সম্প্রদায়ের বিনোদনের আধার স্বাধীনতা উত্তরকালে তা-ই হয়ে ওঠে জোতদার, জমিদার, বাবু সম্পদায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের-প্রতিরোধের প্রধান হাতিয়ার

স্বরূপ। রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে গণনাট্য আন্দোলন থেকে নবনাট্য আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। এই নবনাট্য আন্দোলনের ধারায় গ্রুপ থিয়েটার প্রাধান্য লাভ করে। এর ফলে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ কোণঠাসা হয়ে পড়ে এবং অস্তিত্ব টিকিয়ে প্রয়োজনে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পর্যবসিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের প্রেক্ষাপটে আর্থ-সামাজিক অভিঘাতের বিধ্বস্ত চিত্র তুলে ধরার জন্য পাশ্চাত্যে অ্যাবসার্ড নাট্য ধারার সূচনা হয়। বাংলা নাটকে এই ধারার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে স্বাধীনতাপূর্ব স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা নাটকের বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, চরিত্র চিত্রণ, সংলাপ ভাবনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিরাট বৈসাদৃশ্য ঘটে। বিশ শতকের ষাটের দশকের নাট্য আন্দোলনের ধারায় নবতম সংযোজন অ্যাবসার্ড নাটক। এই ধারার সূত্রপাত ঘটে বাদল সরকারের হাতে। বাংলা অ্যাবসার্ড নাটকের ধারাকে সমৃদ্ধ মোহিত চট্টোপাধ্যায়ও। সুতরাং অ্যাবসার্ড নাটকের ধারা কোনো পূর্বাপর ঐতিহ্যহীন নয়। বরং তার সূত্রপাত নাটকের সৃষ্টির গোড়া থেকেই একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে নাটকের পর্বান্তরের রূপরেখায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা নাটকের ইতিহাসে মোহিত চট্টোপাধ্যায় একজন উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট নাটককার। বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রথম পরিচিতি কবি হিসেবে ঘটলেও মানবিক মূল্যবোধের কারণে তাঁর অতৃপ্ত কবিসত্তা পথ পরিবর্তন করে। কবিতার কল্পনা সুন্দরীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পাড়ি দেন নাটকের জগতে। স্বতন্ত্র ধারায় নিজস্ব রীতিতে তিনি বাংলা নাট্যমঞ্চকে উপহার দিয়েছেন নতুন নাটক, নতুন ভাবনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আধুনিক জীবনের বিচ্ছিন্নতা, নিঃসঙ্গতা, অস্তিত্বের সংকটের পাশাপাশি ভগ্ন মানবসত্তা ও অবক্ষয়িত সমাজসত্তার প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরার জন্য এমন শিল্পরীতির অনুসন্ধান করেছিলেন তিনি যা প্রথাগত ধারা থেকে স্বতন্ত্র। মোহিত চট্টোপাধ্যায় প্রায় শতাধিক দীর্ঘ ও স্বল্পদৈর্ঘ্যের নাটকের মধ্যে তাঁর মানব কল্যাণমূলক চিন্তা ভাবনাকে নিবদ্ধ করেছেন।

জীবনকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করার জন্য মানুষ শিল্পের কাছে যায়। বাস্তবকে সরাসরি উপলব্ধি করার জন্য শিল্প নিজস্ব উপায় অবলম্বন করে। শিল্পের সঙ্গে তত্ত্বের কোন সরাসরি সম্পর্ক নেই। কিন্তু শিল্পী জীবনের বাস্তবতা শিল্পের মাধ্যমে ধরতে গিয়ে নিজের অজান্তে তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি পূর্বেই উপলব্ধি করেছিলেন বাস্তবধর্মী নাটকের মধ্য দিয়ে মানবতার সার্বিক প্রকাশ সম্ভব নয়। সাধারণত রিয়ালিস্টিক নাটকে মানবজীবনকে বর্তমানকালের প্রেক্ষিতে বিচার করার পক্ষপাতি। কিন্তু আমাদের জীবন কেবল কোন একটা কালে নয়, তা তিন কালেই (অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ) আবর্তিত। মানবজীবনে কোনো 'ফিক্সড টাইম এ্যান্ড স্পেস' নেই। তাই তিনি এই 'ফিক্সড টাইম এ্যান্ড স্পেস'র নিয়ম ভাঙার অর্থাৎ ননরিয়ালিস্টিক বা বাস্তবতাবর্জিত নাটক রচনার প্রচেষ্টা করেন। তার প্রথম নাটক 'কণ্ঠনালীতে সূর্য' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে নাট্যজগতে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয় নাটকের অভিনবত্ব নিয়ে। এর কাহিনি উদ্ভট, অবাস্তব, অযৌক্তিক। অবাস্তব অভূতপূর্ব রোগগ্রস্ত এক অজ্ঞাত পরিচয় আগন্তুক লোককে কেন্দ্র করে অযৌক্তিক ঘটনার মধ্য দিয়ে নাটকের সমাপ্তি। নাটকের সংলাপে সংযোগ অভাব লক্ষ করা যায়। আগন্তুক চরিত্রটি কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে ওঠে। তাকে কেন্দ্র করেই নাটকের কাহিনি গতি লাভ করে। নাটকের মধ্যে কিছুই ঘটে না। মানুষের অস্তিত্বের সংকট, জীবনের ব্যর্থতা, অর্থহীনতা আগন্তুক চরিত্রের কথায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। লোকটি 'লস্টনেসে' ভোগে। নাটকের শুরু যেখান থেকে শেষও সেখানেই। নাটকের ঘটনা, আঙ্গিক চরিত্র, সংলাপ প্রভৃতির নিরিখে অ্যাবসার্ডধর্মী মনে হলেও নিহিতার্থে একজন মধ্যম মানের শিল্পীর স্বপ্ন-ব্যর্থতর, বাস্তবতা আর কল্পনার প্রাধান্য রয়েছে। কল্পনা আর বাস্তবের মেলবন্ধনে নাটকটি অ্যাবসার্ড রীতির সার্বিক শূন্যতার দর্শনকে অতিক্রম করে যায়। অ্যাবসার্ড নাটকের দর্শনে মানুষের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। একই বৃত্তের মধ্যে ঘোরা ফেরা করে কিন্তু বৃত্তের বাইরে বেরতে পারে না। দৈনন্দিন জীবন যাত্রা, চিন্তাভাবনা মানুষ নিজের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

জীবনে সব কিছুই অর্থহীন জেনেও বেঁচে থাকতে হয় মানুষকে এটাই অ্যাবসার্ডিটি। নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায় অ্যাবসার্ডিটির এই দর্শনকে পরিহার করে মানুষের মধ্যে নতুন করে বাঁচার প্রেরণা যোগাতে চেয়েছেন তাঁর অভিনব আঙ্গিক প্রধান নাটকে। নাট্য ঘটনা ও সংলাপের মধ্যে এক ধরনের কাব্যময়তা আলাদা মাত্রা নিয়ে আসে। এ প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক একটি উদ্ধৃতি -

> "পাশ্চাত্য অ্যাবসার্ডিটির কাঠামোতে মোহিত চট্টোপাধ্যায়কে চিহ্নিত করা যাবে না। বরং ৬০-এর দশকে প্রতিষ্ঠিত ফরাসী দেশে প্রবল আধিপত্য বিস্তারকারী, 'Poetic avant-guarde' বা 'কাব্যিক আভাঁ-গার্দ' এর সঙ্গে মোহিতের নাটকের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। পাশ্চাত্য অ্যাবসার্ড নাটকের মত অতটা উদগ্র নির্মম না হয়ে, অনেক বেশি কাব্যিক রোমান্টিক ছিল 'কাব্যিক আভাঁ-গার্দ' ইমেজারী ব্যবহার, ভাষার অভিনবত্ব ছিল এই ধরনের নাটক রচনার মূল কাঠামো। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত ফরাসী কবিদের মধ্যে গীঠয়ম, অ্যাপোলোনিয়ার, পল এলুয়ারের কবিতার মধ্যে এই কাব্যিক আভাঁ-গার্দের প্রভাব ছিল। জীবনে চলার পথে যে 'pretension reality' যে বাস্তব ভঙ্গীতে মানুষ 'behave' করে, কথা বলে, তার চলনে যে 'pretension' এর আড়াল থাকে, মিথ্যে থাকে, প্রবঞ্চনা থাকে মোহিত তাকে নাটক রচনায় অস্বীকার করতে চাইলেন।"[১]

'মৃত্যুসংবাদ', 'সিংহাসনের ক্ষয়রোগ', 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড', 'গন্ধরাজের হাততালি', 'ক্যাপ্টেন হুররা', 'বর্ণ বিপর্যয়', 'বাঘবন্দী' প্রভৃতি এই ধারার অনুসারী নাটক। তাঁর দ্বিতীয় নাটক 'নীলরঙের ঘোড়া'য় ম্যাজিক রিয়ালিজমের প্রভাব অনেক বেশি। 'তোতারাম', 'মুষ্ঠিযোগ, 'লাঠি' প্রভৃতি নাটকে ম্যাজিক রিয়ালিজমের প্রভাব রয়েছে।

‘রাজরক্ত’ অ্যাবসার্ডধর্মীতার পাশাপাশি রাজনৈতিক মাত্রা গুরুত্ব লাভ করেছে। নাটকে তিনি ‘হীরামন’ নাটকে ‘ব্ল্যাক কমেডি’ তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তাঁর নাটকে ব্যবহৃত বিভিন্ন তত্ত্বের ধারণা এই আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মানুষ এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই তিনি নাটক রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন বর্তমান সমাজ পরিবেশ বসবাসকারী অধিকাংশ মানুষ অসুখী, সুখ-স্বপ্নহীন অসন্তোষের কণ্টকিত জীবনে সজীব সুন্দর হয়ে ওঠার কোনো আশা নেই। তা রয়েছে কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগীদের হাতে। এক্ষেত্রে শিল্প সংস্কৃতি দায় এড়িয়ে যাবার নয়। তাঁর মতে একজন সচেতন শিল্পীর দ্বারাই সম্ভব সমাজ ও জীবন বদলে দেওয়ার, মানুষের শান্তি স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে দেওয়ার। একজন আদর্শ লেখক মানুষ ও সমাজের বিবেকের ভূমিকা পালন করেন। মোহিত চট্টোপাধ্যায় যখন নাটক লিখতে শুরু করেন তখন বাংলার আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ছিল জটিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সংকট নিয়ে জটিল আর্থ-সামাজিক আবর্তে নাটকের চরিত্রের আদল বদলে যায়। বদলে যয় ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের নিরিখে শিল্পী-সাহিত্যিকদের জীবনদর্শন ভাবনা। জটিল আবর্তে বাস্তব জীবনের বাইরে ব্যক্তিসত্তার অবচেতন স্তরের পরিচয় সন্ধানের প্রয়াস দেখা যায় শিল্পী সাহিত্যিকদের মধ্যে। সংবেদনশীল কবি ও নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায় ইউরোপীয় দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েও তিনি তাঁর স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন সৃষ্টি ক্ষেত্রে। তিনি প্রথাসিদ্ধ কাহিনি, চরিত্র ও আঙ্গিকে গণ্ডীতে নিজেকে বন্দী করে রাখেননি। বাস্তবের দৃশ্যত জীবনের অনুসরণ, অনুকরণ করেও ‘ফ্যানটাসি’, ‘ইনার রিয়ালিটি’, ‘অ্যাবস্ট্রাকসন’ বা ‘স্যাডো অফ রিয়ালিটি’র আশ্রয়ে বাসবের মধ্যে নিহিত সত্যের এক ভিন্ন চেহারা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। এই বাস্তবতার বাহ্যিক রূপকে পরিহার করে অন্তর্বাস্তবতার প্রকাশের মধ্য দিয়ে নাটকে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তিনি প্রচলিত

ধারা থেকে সরে এসে নিজস্ব পথে চালিত হয়েছেন। তিনি মানুষের মানবিক সত্তার দ্বৈত রূপকে ধরার চেষ্টা করেছেন তাঁর নাটকে। এই প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি –

> " আসলে মানুষ বহু কথা, বহু সত্যের সঙ্গেই পরিচিত, কিন্তু সেই পরিচিত কথা বা truth-গুলো মানুষের মনে নির্জীব হয়ে থাকে, তার তাৎপর্য তেমন উচ্চকিত থাকে না – লেখক তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে সেই নির্জীবকে সজীব করে তোলেন, নিষ্প্রভকে প্রোজ্জ্বল করে তোলেন, যা তাৎপর্যহীন ছিল তাকে গভীর তাৎপর্য দান করেন যার ফলে চেনা কথা অচেনার মহিমা পায়, শোনা কথা নতুনত্বের বিস্ময় নিয়ে আসে।"[২]

১৯৬৩ সালে 'গন্ধর্ব' নাট্য পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম নাটক 'কণ্ঠনালীতে সূর্য'। এই নাটকের কাহিনিতে রয়েছে বেঁচে থাকার অসহনীয় পরিস্থিতির কথা। যেখানে আপাত উদ্ভট কাহিনির অন্তরালে একজন শিল্পীর স্বপ্ন - ব্যর্থতার ইতিহাস ব্যাপ্ত। নাটকের কাহিনি আগন্তুক চরিত্রকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। নাটকের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর এক ভয়াবহ রূপ তুলে ধরেছেন নাটককার। আসলে আগন্তুক চরিত্রে রূপকে স্বল্প প্রতিভাধর শিল্পী জীবনের গভীর সংকটময় পরিস্থিতির কথা প্রকাশিত। নায়ক তার শিল্পীসত্তায় সূর্যের মতো বিরাট কিছু প্রকাশ করতে চায় কিন্তু তা তার সাধ্যের বাইরে। সাধ্য আর অসাধ্যের সংকটের গভীরতম রূপক ব্যঞ্জনা হল কণ্ঠনালীতে সূর্য এবং পিংপং বলের বুদ্বুদ। এই রূপক কবি মোহিত থেকে নাটককার মোহিতের উত্তরণকেও ব্যঞ্জিত করে।

'নীলরঙের ঘোড়া' নাটকে বাস্তব আর কল্পনার মিশ্রণে গড়ে ওঠা এর কাহিনির মধ্যে যাপিত জীবন আর কল্পিত জীবনের সমন্বয় সাধন করেছেন। আপাত উদ্ভট এক কাহিনির মধ্য দিয়ে সম্পর্কের বুনট ও সম্পর্কের ভাঙ্গন তুলে ধরা হয়েছে এই নাটকে।

অন্য দৃষ্টিতে ও অন্য আলোয় দেখা এক জীবনের নাটক এই‘ নীলরঙের ঘোড়া’। সে আলোর রং নীল যা কল্পনার রঙে— স্বপ্নের রং-এ মিশে যায়। নীলরঙের ঘোড়া হল বর্ণনায় কল্পনা যা ছন্দময় গতির ইঙ্গিতে ভরা। এই ঘোড়া হারিয়ে গেলে মানুষের সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাও ধূসর হয়ে যায়।

১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয় ‘মৃত্যুসংবাদ’ নাটকটি। এই নাটকে রয়েছে এক আগন্তুকের কাহিনি যে তার বাবাকে খুন করে পুলিশের ভয়ে পালিয়ে বুলবুলদের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। এই আগন্তুক লোকটির বাবা যে তার অস্তিত্বের মূলাধার আবার অস্তিত্ব সংকটের মূল কারণ। সে তার জন্মদাতাকে হত্যা করার পর নিজেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিবেক বলে উল্লেখ করে। নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায় এই চরিত্রটির মাধ্যমে আমাদের প্রচলিত কতগুলি সংস্কারের মূলে আঘাত হেনেছেন। আসলে জন্মদাতাকে হত্যা করা আগন্তক লোকটির ধারণামাত্র। আগন্তুক লোকটি হল অস্থির সময়ের সচেতন ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। নাটকটি নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, এটিই তাঁর মঞ্চে অভিনীত প্রথম নাটক। বাংলা নাটকের ইতিহাসে অ্যাবসার্ড নাটকের বাংলা পরিভাষা হিসেবে ‘কিমিতি’ শব্দের প্রয়োগ ঘটে।

‘গন্ধরাজ হাততালি’ নাটকটি ব্যক্তির পরিচয় ও পরিচয় হীনতার সমস্যাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। আগন্তুক চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় মোহিতবাবুর এই নাটকে। প্রণব আর হরি কিঙ্কর এই দুটি আগন্তুক চরিত্র ছাড়া অরুণ এবং নীরা এই চারটি চরিত্রের আলাদা আলাদা সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়েছে। প্রত্যেকটি রিলেশন একটা আইডিয়া। মহাযুদ্ধের মধ্যে বসবাসকারী সমস্ত রাষ্ট্র সমাজ ব্যক্তি ক্ষণভঙ্গুর। যুদ্ধ সভ্যতাকে ধ্বংস করে, শান্তি ও প্রেম সভ্যতাকে গড়ে তোলে। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন ভালবাসা। গন্ধরাজের হাততালি হল এই ভালোবাসার দ্যোতনা।

ভালোবাসার বন্ধন না থাকলে জীবন যে নেতিবাচক হয়ে পড়ে তারই এক দৃষ্টান্ত 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড' নাটকটি। ভালোবাসার বন্ধন যাবতীয় প্রতিরোধকে দূর করতে সক্ষম। এই নাটকের নাটক ঘটনা ঘটেছে প্রাসাদ তুল্য এক পোড়ো বাড়িতে। ক্ষমতান্ধ রাজনৈতিক শক্তি প্রেমকে প্রতিহত করতে চায়। নাটকে দেখা যায় এক সমাবেশে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, এক প্রৌঢ় ডাক্তার রাধাগোবিন্দ, থানার ইন্সপেক্টর, স্কুল শিক্ষিকা শান্তা এবং বাড়ির মালিক মল্লিকবাবু তারা সকলে উপস্থিত হয়েছে— মৃত্যুর পর অশরীরী প্রেতাত্মা খুঁজতে। শান্তার হাতে সাদা ফুলের গুচ্ছ আলোর প্রতীকস্বরূপ— যা মৃত্যুকে পাহারা দেবে। শান্তা বিশ্বাস করে ভয়ংকর অলৌকিক ঘটনায়। মৃত প্রেতও ভালোবাসতে চায়। এই নাটকের নায়ক তার নেতিবাচক মনোভাব দূর করার জন্য চেয়েছিল এক নারীর ভালোবাসা। আলো-আঁধার, বিশ্বাস অবিশ্বাস সবকিছু মিলিয়ে আশ্চর্য ঘটনার ইঙ্গিত দেয় এই নাটক। চন্দ্রলোক হল সুস্থ জীবনের ইঙ্গিত। কল্পলোকের কর্তৃপক্ষ, শাসকের প্রতিনিধি বিপদজনক ঘোষণা করে একে। তারা চাঁদের আলোকে মাটি চাপা দিতে চেয়েছিল। অলৌকিক বাতাসের খপ্পরে সমস্ত দেশ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, বন্ধ হয়ে যায় বাঁচার সমস্ত পথ। প্রেতাত্মারও মৃত্যু হয় গুলিতে। জীবন প্রত্যয়ী এই নাটকে অগ্নিকাণ্ডের মত দুর্ঘটনায় চন্দ্রালোকও মানুষের জীবনে অভিশপ্ত হয়ে ওঠে।

অস্তিত্বের অর্থহীনতার নাটক 'দ্বীপের রাজা'। এখানে স্বপ্ন আর দুঃস্বপ্নের মধ্যে এটা সেতুবন্ধন আবিষ্কারের চেষ্টা রয়েছে। ১৯৭০-৭১ সালের ঝড়ের হাওয়ার পটভূমিকায় মধ্যবিত্ত পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর সাজানো-গোছানো সংসারের চিত্র বর্ণিত হয়েছে 'বাঘবন্দী' নাটকে। বাস্তব আর অবাস্তব আলোছায়ায় সম্পর্কের এক নতুন দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন নাটককার। 'রাজরক্ত' নাটকে রাজনৈতিক মাত্রা লক্ষ করা যায়। নাটকে ঘটে যাওয়া ঘটনা গণনাট্য আন্দোলনের উদ্দেশ্যকে দ্যোতিত করে। সমবেত জনতার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় রাজাসাহেবের পরাজয় নিশ্চিত করার ইঙ্গিত রয়েছে এই নাটকে।

সাধারণ জনগণের ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের কথা তুলে ধরেছেন তাঁর 'মাছি' একাঙ্ক নাটকে। বন্যা কবলিত এক গ্রাম বাংলার কাহিনি এই নাটকে রয়েছে। 'তোতারাম' নাটকে মানবিক মূল্যবোধের কাহিনি বর্ণিত। অবক্ষয়িত সমাজব্যবস্থায় মানবিক মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন তোতারাম চরিত্রের মাধ্যমে। রূপকথা ও পুরাণের কাহিনি অবলম্বন করে 'সিদ্ধিদাতা', 'শমীবৃক্ষ' 'মল্লভূমি', 'নিষাদ', 'রাক্ষস', 'তোতারাম' নাটক রচনা করেছেন তিনি। এই সকল নাটকের ক্ষেত্রে তিনি পুরানো ঐতিহ্যের নব রূপায়ন ঘটিয়েছেন স্বকীয় প্রতিভায়। তিনি পাশ্চাত্যের বেশ কয়েকটি নাটকের অনুবাদ করেছেন। অনুবাদ করা নাটক নাটককারের অসামান্য প্রতিভার গুণে মৌলিকতা দাবী রাখে। তিনি কয়েকটি জীবনী নাটক রচনা করেছেন। গ্যালিলিওর জীবনী অবলম্বনে লেখা নাটকটি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। অনেকের মতে সেই সময় তিনটি অনুবাদ করা নাটকের মধ্যে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদকর্মটি শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করে। এছড়া হেলেন কেলারের জীবনী, বাণভট্ট, এবং সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধের জীবনী নাটক তিনি রচনা করেছেন। তাঁর শেষ নাটক 'তথাগত' তাঁরই জীবনের আত্মানুসন্ধানের ফসল। 'কণ্ঠনালীতে সূর্য' নাটকের মধ্য দিয়ে যে অস্তিত্ব সন্ধানের যাত্রা শুরু হয়েছিল তা পূর্ণতা লাভ করে বুদ্ধের পরিনির্বাণে। যে সংকত, হতাশা, যন্ত্রণা– সব কিছুর নিরসন হয় বুদ্ধের বাণীতে, পরম ক্ষমার মধ্যে প্রাপ্ত হয় সকল শান্তি। নাটকে জগতে পথ চলা থেকে 'তথাগতে' বিলীন হওয়ার নিরবচ্ছিন্ন কাহিনি যেন মোহিত চট্টোপাধায়ের সংঘাতময় ব্যক্তি জীবনের এক পূর্ণাঙ্গ নাটক।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলা নাট্য আন্দোলনের ধারা চেতনাপ্রবাহের ভাবধারা, পরাবাস্তববাদ, জাদু বাস্তববাদ, অ্যাবসার্ড ভাবনা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, সলিল সেন, শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায় ও মনোজ মিত্র প্রমুখ কৃতিমান নট ও নাটককাররা এই নাট্য আন্দোলের ধারাকে সক্রিয় করে তুলেছিলেন তাদের নাট্য সৃজন এবং

নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে। সমকাল বা প্রায় সমকালে আবির্ভূত এই সকল নট ও নাটককারগণ একই সমাজের প্রতিনিধি হয়েও প্রত্যেকে তাঁদের নাট্যসৃজনকে ভিন্ন ভিন্ন ধারায় চালিত করেছেন। স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী কালে নাট্যভাবনা সঙ্গে। স্বাতন্ত্র্য শুধু আঙ্গিক ভাবনা, চরিত্র-চিত্রণ, সংলাপ সৃষ্টিতে নয়, স্বাতন্ত্র্য মঞ্চায়নের ক্ষেত্রেও। এই সময়কালের নাট্যকারদের হাতেই বাংলা নাটকের যথার্থ মুক্তি ঘটে। তাঁদের হাতেই বাংলা নাটক বিশ্বনাট্যের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করে। এই সময়কালের নাটক রচনায় আশ্চর্য ব্যতিক্রমী ছিলেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য নাট্যকারগণ যখন প্রথাগত ধারায় চালিত হচ্ছেন, নাটককার মোহিত ভিন্ন পথে নিজেকে চালিত করেছেন। বাদল সরকার এবং মোহিত চট্টোপাধ্যায় দুজনেই কবিতার জগৎ থেকে নাটকের জগতে এসেছেন। দুজনেই নাট্যাঙ্গিকে পুরানো প্রথাকে ভেঙে বাংলা নাটককে মুক্তি দিয়েছেন। দুজনেই বাংলা নাটকে অ্যাবসার্ড ধারাকে লালিত করেছেন। তা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। একই কেন্দ্র বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে বিপরীত মেরুতে প্রদক্ষিণ করেছেন তাঁরা। অন্যান্য নাট্যকারদের নাটকে ঘটনা পরম্পরা লক্ষিত হয়। তাঁদের সংলাপ যৌক্তিক ঘটনা অনুসারী। তাঁদের নাটকে চরিত্রের ভাষা সংযোগ রক্ষা করে চলে। কিন্তু মোহিত চট্টোপাধ্যায় কাহিনির ঐক্য ভেঙে দিয়েছেন। তাঁর নাটকের চরিত্রেরা আগন্তুক, চরিত্রগুলির অযৌক্তিক, উদ্ভট প্রকৃতির। তাদের ভাষা যৌক্তিক পারমর্য মেনে চলে না। তাদের ভাষায় সংযোগের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বাংলা নাটকের জগতে আবির্ভাব বিজন ভট্টাচার্যের। তিনি এমন এক সময় বাংলা নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন যখন বাংলা নাটকে বন্ধ্যাদশা চলছিল এবং পেশাদারী রঙ্গমঞ্চগুলি নতুন নাট্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবার বাসনা হারিয়ে ফেলেছিল। সে সময় যেসব ঐতিহাসিক ধর্মমূলক পৌরাণিক, সামাজিক নাটক রচনা হচ্ছিল তাতে সমকালের স্বরূপ সঠিকভাবে উদ্ঘাটিত হচ্ছিল না। তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক অভিঘাত ও আন্দোলন। তাঁর নাটকে নিপীড়িত

মানুষের সমবেত শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস লিপিবদ্ধ। তিনি ছিলেন গণনাট্য সংঘের পথপ্রদর্শক।

তুলসী লাহিড়ী একইসঙ্গে সুরকার, গীতিকার, অভিনেতা ও নাট্যকার হিসেবে বাংলা নাটক জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি গণনাট্য সংঘে যোগ দিলেও পরবর্তীকালে গণনাট্য সংঘ থেকে বেরিয়ে এসে নতুন নাট্যগোষ্ঠী গড়ে তোলেন। তাঁর চিন্তাধারা ছিল শোষিত, নির্যাতিত মানুষের জীবননাট্য রচনা করা। তাঁর জীবন দৃষ্টি সমাজতান্ত্রিক ভাবনায় উদ্বুদ্ধ। সমাজের শোষক, অত্যাচারী বিবেকহীন মানুষের বিরুদ্ধে তিনি গর্জে উঠেছিলেন। সাধারণ মানুষের প্রতি দরদ ও সহানুভূতি তাঁকে ভাবপ্রবণ করে তুলেছিল। কৃষক, মজুর, নিম্ন-মধ্যবিত্ত কুলি, কামিন, সাঁওতাল, দালাল এই সমস্ত চরিত্র তাঁর নাটকে বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। তিনি দেখিয়েছেন বেঁচে থাকার তাগিদে সংঘবদ্ধ হওয়ার কথা।

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের নাটকের মধ্যে সমাজচিন্তা, অর্থনৈতিক ভাবনা সেই সঙ্গে সংকট অতিক্রমের ইতিবাচক মনোভাব লক্ষ করা যায়। দেশের প্রচলিত জীবনধারার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতনতা তাঁর নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে। জীবন ঘনিষ্ঠ বস্তুবাদী চেতনায় মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি যাবতীয় পারিবারিক ও সামাজিক পরিস্থিতির বিবেচনা করেছেন। স্বাধীনতা উত্তর বাংলা নাট্য সাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য নাট্যকার হলেন সলিল সেন। তাঁর নাটকে বিধ্বস্ত মানব সমাজ প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি জীবনের বাস্তবতার দিককে তাঁর রচনায় সূক্ষ্ম চিন্তা-চেতনায় প্রতিবিম্বিত করেছেন। তিনি তাঁর সমসাময়িক উদ্বাস্তু সমস্যাকে কেন্দ্র করে নাটক রচনা করেছেন। তাঁর নাটক বিচিত্র মানুষের ভিড় এইসব মানুষের বৈশিষ্ট্য জীবিকার সন্ধান ও জীবনযাপন প্রণালী বৈচিত্র্যে ভরা তাঁর নাট্য কাহিনি।

নাটক যে শুধুমাত্র বিনোদনের মাধ্যম নয় রাজনৈতিক চেতনা বিকাশের হাতিয়ার এবং শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অন্যতম মাধ্যম - এ উপলব্ধি উৎপল দত্তের নাট্য চেতনায় স্পষ্ট। মার্কসবাদী চিন্তা ধারায় উদ্বুদ্ধ নাট্যকার উৎপল দত্ত চেয়েছিলেন দর্শক ও থিয়েটারের সঙ্গে সংযোগ গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে জনচেতনা জাগাতে। উৎপল দত্ত তাঁর নাটকে দেখিয়েছেন মানুষের মুক্তির লড়াইয়ের কাহিনি। মানুষের মুক্তি যেখানে অবরুদ্ধ হয়েছে মুক্তিকামী মানুষের সংঘবদ্ধভাবে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। তাই তাঁর নাটকে বার বার ফিরে এসেছে সামন্ততন্ত্র, রাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ সাম্প্রদায়িক চেতনা এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ।

শম্ভু মিত্র ও উৎপল দত্তের পরেই বাংলা থিয়েটারের জগতে পৌনঃপুনিকতা অনুসরণ ও বামপন্থী রাজনীতির প্রচার, বিদেশি নাটকের অবিকল করা এরকম এক স্থিতাবস্থায় প্রচণ্ড আঘাত করতে চেয়েছিলেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি নাটক নির্বাচনের জন্য বার বার ফিরে গেছেন বিদেশের নাট্যকারদের কাছে। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নাট্য জীবন শুরু করেন গণনাট্য সংঘের আওতায়, কিন্তু পরবর্তীকালে এই গণনাট্য ত্যাগ করে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন নান্দীকার নাট্যগোষ্ঠীর। বাংলা নাটকের জগতে যাঁরা বিদেশি নাট্য ফর্মের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বাদল সরকার। তাঁরই হাতে প্রথম বাংলা অ্যাবসার্ড নাট্যধারার সূত্রপাত। নাট্যকার বক্তব্যকে স্পষ্ট করে দর্শকের কাছে পৌঁছে দেবার চিন্তাধারা থেকেই থার্ড থিয়েটারের উদ্ভব।

মনোজ মিত্রের জীবনমুখী বক্তব্য, গভীর মানবিকতা, উন্নত কারুকার্য, নাটকের বিষয় ভঙ্গির বৈচিত্র্য সমসাময়িক নাট্যকারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। তিনি তাঁর নাটকের মধ্যে দুর্বল, অসহায়, অবহেলিত, পর্যুদস্ত মানুষের সংগ্রামের চিত্র ধরতে চেয়েছেন। শ্রেণি চরিত্রকে প্রাধান্য না দিয়ে মানুষকে নিয়ে আসেন ঘটনার কেন্দ্রে।

মানুষের মধ্যে থাকা ভালো-মন্দ, জটিলতা–নীচতা, মহত্ত্ব-ঔদার্য ও ক্ষমা- নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি দুরূহ দ্বান্দ্বিক সমন্বয়কে তিনি নির্দিষ্ট কোনো ছাঁচে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন নি। অত্যাচার শোষণের বিরুদ্ধে শোষিতের জয় প্রতিষ্ঠা, ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে সত্য ও মানবিকতার প্রতিষ্ঠা, বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে ভালোবাসার প্রতিষ্ঠা এবং মৃত্যুর বিকল্পে জীবনের প্রতিষ্ঠা তাঁর নাটকে মূল প্রতিপাদ্য।

সমসাময়িক নাট্যকারদের অন্যতম মোহিত চট্টোপাধ্যায় তাঁর নাটকে মানুষের প্রতি সমাজের প্রতি গভীর আস্থা দেখিয়েছেন। তাঁর নাটক বিনোদনের জায়গা থেকে সরে এসে দর্শকের বুদ্ধিমত্তার কাছে আবেদন জাগায়। তাঁর নাট্য জীবনে প্রথম পর্যায় তিনি অদ্ভুতধর্মী নাটক রচনা করলেও মানবিক মূল্যবোধের দিকটি তিনি এড়িয়ে যাননি। একইসঙ্গে কবি ও নাটককার হওয়ার কারণে সংলাপের ভাষা কাব্য সুষমামণ্ডিত, সহজ-সরল, পরিশীলিত। একই সঙ্গে তিনি সাধু, চলিত, ইংরেজি, হিন্দি ভাষার ব্যবহার করেছেন তার সংলাপে। নাটকের বিষয়বস্তু, চরিত্র চিত্রণ, নাট্য আঙ্গিক প্রভৃতি বিষয়ে তিনি তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য নাট্যকারদের থেকে স্বতন্ত্র ছিলেন।

নাটক এক ধরনের মিশ্র শিল্প। সেদিক থেকে সাহিত্য সংরূপের অন্যান্য মাধ্যম গুলোর তুলনায় নাটক ভিন্নতর গুরুত্ব লাভ করে। সাহিত্যের অন্যান্য মাধ্যমগুলি দ্বিমাত্রিক উপাদান ভিত্তিক কিন্তু নাটক ত্রিমাত্রিক (নাট্যকার অভিনেতা ও দর্শক)। তাই রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে নাটকের গভীর যোগ রয়েছে। মঞ্চ সাফল্যে নাটকের সার্থকতা অনেকখানি নির্ভর করে। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত পাঠ করে নাটকের অংশ গ্রহণ করা যায় কিন্তু তা অতি মাত্রায় সার্থকতা লাভ করে দর্শক সমক্ষে মঞ্চায়ন সাফল্যে। নাট্যকার তাঁর গভীর জীবনদর্শন নাটকের সৃষ্ট চরিত্রের মাধ্যমে ব্যক্ত করেন। অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শক সমক্ষে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বিশ শতকের ষাটের দশকে রাজনৈতিক

ও আর্থ-সামাজিক জটিলতায় সৃষ্টি হয় গণনাট্য, নবনাট্য, থার্ড থিয়েটার, অ্যাবসার্ড থিয়েটার প্রভৃতি নাট্য আন্দোলনের। এই সময়কার সকল নাট্যকার প্রায় কোনো না কোনো নাট্য সংস্থার কর্ণধার, নির্দেশক, পরিচালক বা অভিনেতা ছিলেন। মঞ্চের প্রয়োজন মেটাতে তাঁদের সৃষ্টি করতে হয় নাটকের। নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায় কোন নাট্য সংস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত ছিলেন না। তিনি একের পর এক অসাধারণ নাটক সৃষ্টি করেছিলেন যা নাটকের জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী। মোহিত চট্টোপাধ্যায় যখন নাট্য রচনায় হস্তক্ষেপ করেন তার আগেই বাংলা রঙ্গমঞ্চে গণনাট্য ও নবনাট্য পরে গ্রুপ থিয়েটারের সূত্রপাত ঘটে গেছে। আত্মপ্রকাশ করেছে তুলসী লাহিড়ীর ‘পথিক’ নাটক প্রযোজনার মধ্যে দিয়ে বহুরূপী নাট্যদলের। পরে পি. এল. টি, নান্দীকার, থিয়েটার ইউনিট, থিয়েটার কমিউন, সংস্তব, থার্ড থিয়েটার, বিজন থিয়েটার, সুন্দরম থিয়েটার প্রভৃতি বাংলা রঙ্গমঞ্চকে সমৃদ্ধ করেছে। অ্যাবসার্ড নাটক বাংলা নাট্য আন্দোলনের ধারায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ধারার অন্যতম প্রধান নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায় কেবল থিয়েটারের প্রয়োজন মেটাতে নাটক রচনায় হাত দেননি। সমাজকল্যাণ ও মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যেই তাঁর নাটক রচনা। বলাবাহুল্য যে তাঁর লিখিত প্রথম পর্যায়ের নাটক কোন থিয়েটার গ্রুপ মঞ্চস্থ করতে সাহস পায়নি। যেমন রবীন্দ্র নাটকের মঞ্চায়ন করতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছিল। রবীন্দ্র ভাবনার উপযোগী নাট্য দর্শক তৈরি হতে সময় লেগেছিল। পাশ্চাত্যের বিখ্যাত অ্যাবসার্ড নাটক ‘ওয়েটিং ফর গোডো’র প্রথম অভিনয় দর্শককে হতাশ করেছিল। অবশ্য পরবর্তী অভিনয় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম নাটক ’কণ্ঠনালীতে সূর্য’ ১৯৬৩ তে মুদ্রিত হলেও তার প্রথম অভিনয় হয় ২১শে মার্চ ১৯৬৬ সালে শ্যাম স্কোয়ারে ‘আনন্দম্’ এর উদ্যোগে। নান্দীকার গোষ্ঠী ‘বৃত্ত’ নাটকটি প্রযোজনা করলেও ‘কণ্ঠনালীতে সূর্য’ প্রযোজনা করতে সাহস পায়নি। গন্ধর্ব নাট্যদল মহড়া শুরু করেও শেষ পর্যন্ত মঞ্চস্থ করতে পারেনি এই নাটকটি। পাঠক মহলে নাটকটি সমাদৃত

হলেও এধরনের নিয়মভঙ্গের নাটক মঞ্চায়নে দর্শক সমাজের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অনেকেই দ্বিধান্বিত ছিলেন। পরবর্তীকালে কলকাতা, চিত্তরঞ্জন, দুর্গাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে 'কণ্ঠনালীতে সূর্য' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। ১৯৬৪ সালে ক্লিমেন্স ডেনের রচনা অবলম্বনে মোহিত চট্টোপাধ্যায় 'উইল শেকসপিয়র: একটি কল্পনা' নামে কাব্যনাট্যের অনুসৃজন করেন। শেকসপিয়রের কার্টার সেন্টিনারি উপলক্ষ্যে শ্যামল ঘোষের নির্দেশনায় নক্ষত্র নাট্যদল এ কাব্যনাট্য মহলা শুরু করে। অনেক চেষ্টা করেও তারা এই কাব্যনাট্য মঞ্চস্থ করতে পারেনি। ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে কলামন্দিরে নাটকটির প্রথম অভিনয় হয় অসিত বসুর নির্দেশনায় ক্যালকাটা পিপলস থিয়েটারের প্রযোজনায়। পরে ১৯৭৬ সালের ২০শে জুলাই আকাদেমিতে জামসেদ পুরের বার্তিক সংস্থার প্রযোজনায় অভিনয় হয়। 'নীলরঙের ঘোড়া' নাটকের প্রথম প্রযোজনা করে চতুর্মুখ নাট্যদল। অসীম চক্রবর্তী নির্দেশনা দিয়েছেন। আলো, আবহ, মঞ্চ এসবের মধ্যে পরাবাস্তব জগৎকে ধরার চেষ্টা রয়েছে। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম মঞ্চসফল নাটক 'মৃত্যুসংবাদ'। ১৯৬৪ সালের ২৬ শে সেপ্টেম্বর রবিবার সকাল দশটায় শ্যামল ঘোষের নির্দেশনায় রঙমহলে প্রথম অভিনয় হয়। প্রেক্ষাগৃহে সমাগত দর্শকদের অধিকাংশই ছিলেন কবি ও প্রথম শ্রেণির বুদ্ধিজীবী। এই ধারার নাটকগুলি ছিল বাংলায় নতুন আমদানি এবং দর্শক, সমালোচকরা তাকে পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারছিল না। 'মৃত্যুসংবাদ' নাটকের প্রযোজনা নিয়ে কবি শঙ্খ ঘোষ বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন। প্রায় চার দশক পর বাংলাদেশের ঢাকায় অল্টারনেটিভ লিভিং থিয়েটার প্রবীর গুহের নির্দেশনায় ২০০০ সালের মে মাসে 'মৃত্যুসংবাদ' নাটকের অভিনয় করে। ১৯৬৬ সালের ২৭ জানুয়ারি কমল ঘোষ দস্তিদার ও তড়িৎ চৌধুরীর যুগ্ম প্রযোজনায় 'বাইরের দরজা' একাঙ্ক নাটক মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে অভিনয় হয়। নাটকটি মঞ্চ- বেতার দূরদর্শনে প্রচার পায়। মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে 'সোনার চাবি' নাটকেরও প্রথম অভিনয় হয়। নির্দেশনায় ছিলেন শ্যামল ঘোষ। 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড' নাটকটি শ্যামল ঘোষের নির্দেশনায় মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে অভিনীত

হয়। ১৯৬৭-র ৬ আগস্ট মনোজ মিত্রের নির্দেশনায় রঙমহলে গন্ধরাজের হাততালি অভিনয় হয়। ১৯৬৮ সালের ২৫ ডিসেম্বর রঙমহলে 'সিংহাসনের ক্ষয়রোগ' দীপেন্দ্র সেনগুপ্তের নির্দেশনায় বেহালার অনুকার নাট্যদল প্রযোজনা করে। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর এক ঘণ্টা পনের মিনিট পর আকাদেমিতে তাঁর শেষ নাটক 'তথাগত' অভিনয়ের মাধ্যমে রঙ্গপট নাট্যদলের সমস্ত শিল্পীবৃন্দ পিতৃতুল্য নাটককারের তর্পণ সমাপ্ত করেন। অভিনয় শেষে তাঁর শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়। তিনি একমাত্র নাট্য ব্যক্তিত্ব যিনি একা এবং একক ছিলেন। তাঁর কোনো দল ছিল না। কাব্য রচনা ত্যাগ করে নাটক রচনার দুরূহ কাজে প্রায় পাঁচ দশক অতিবাহিত করেছেন। সমসাময়িক সমস্ত নাট্যদল ও বাংলা রঙ্গমঞ্চকে সমৃদ্ধ করেছেন তিনি। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগ গড়ে উঠেছিল।

নাটক লেখার মধ্যেই তিনি একধরনের পরমার্থিক আনন্দ খুঁজে পেয়েছিলেন। যে নাটক ছিল তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি –"This my product, absolutely mine, next to god, it's created by me alone. ... This isn't a part of my life – this is the existence of my life."[৩] তিনি নিজের অস্তিত্বের মূল্য খুঁজে পেয়েছিলেন নাটকের মধ্যে। নাট্যশিল্প ছিল তাঁর কাছে আবিষ্কারের মতো। তিনি মনে করতেন- "my theatre is a new knock on the door"[৪] সাধারণ মানুষের দুঃখ, বেদনা, হতাশা যন্ত্রণা নিয়েই তাঁর নাটক রচনার সূত্রপাত। অন্তর জগৎ থেকে বহির্জগতে পাড়ি দিয়েই তাঁর নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে। তিনি নাটকের হতাশা ব্যঞ্জক পরিণামের পরিবর্তে শুভ ও সুন্দরের জয় ঘোষণা করেছেন। তিনি আজীবন নাটক নিয়ে ভাঙা গড়ার খেলা খেলেছেন। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন সংযোজন, আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চকে সতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে আজীবন প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। ভবিষ্যতে তাঁর এই মহৎ প্রচেষ্টার পূর্ণ মর্যাদা প্রাপ্তির প্রার্থনা জানিয়ে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের ইতি টানলাম।

তথ্যসূত্র

১। রায়, শুভঙ্কর (অতিথি সম্পাদক) : প্রমা, মোহিত চট্টোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা, ২০১৩, কলকাতা -৭৩, পৃষ্ঠা – ১১৮ - ১১৯।

২। তদেব, পৃষ্ঠা - ৯।

৩। সেনগুপ্ত, সুতপা : নিরীহ সরলরেখার অন্তরালে, অনুষ্টুপ, অনিল আচার্য (সম্পাদনা), ২০১১, কলকাতা- ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা - ১৭।

৪। রায়, শুভঙ্কর (অতিথি সম্পাদক) : প্রমা, মোহিত চট্টোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা, ২০১৩, কলকাতা -৭৩, পৃষ্ঠা – ৮।